

শ্রেষ্ঠ কিশোরগল্প

শ্রেষ্ঠ কিশোরগল্প

মঈনুল আহসান সাবের

শ্রেষ্ঠ কিশোরগল্প
মঈনুল আহসান সাবের

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৪

তাম্রলিপি : ৭৯৭

প্রকাশক
এ কে এম তারিকুল ইসলাম রনি
তাম্রলিপি
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
ফ্রব এষ

বর্ণবিন্যাস
তাম্রলিপি কম্পিউটার

মুদ্রণ
মা প্রিন্টিং প্রেস
১৮/২৩ গোপাল শাহ লেন, ঢাকা

মূল্য : ২৮০.০০

Srestho Kishoregolpo

By : Moinul Ahsan Saber

First Published : February 2024 by A K M Tariqul Islam Roni
Tamralipi, 38/4 Banglabazar, Dhaka-1100

Price : 280.00

\$10

ISBN : 978-984-98741-4-0

তাম্রলিপি

উৎসর্গ

কথাশিল্পী মাসুম বিল্লাহ
প্রিয়জনেষু

ভূমিকা

ছোটদের জন্য লেখালিখি এক কঠিন কাজ। অথচ এই ছোটদের জন্য লেখা দিয়েই আমার লেখালিখির শুরু। সেটা ১৯৭২ সালের কথা। ‘টাপুর টুপুর’ নামে ছোটদের একটা পত্রিকা ছিল। সেখানে বের হলো ছোটদের জন্য লেখা আমার প্রথম গল্প ‘তুহিন তোকে বলছি’। গল্পটা বেশ প্রশংসা পেল। এর আগে আরো আরো অনেকের মতো স্কুল ম্যাগাজিনে লেখা বেরিয়েছে। সেগুলোও প্রশংসা পেয়েছে। ‘তুহিন তোকে বলছি’র পর আরো কিছু লেখা বের হলো এদিক-ওদিক। কিন্তু কী আশ্চর্য ছোটদের জন্য লেখালিখিতে আমি নিয়োজিত হলাম না। লিখতে শুরু করলাম বড়দের জন্য। তবে ছোটদের জন্যও লেখালিখি চলল। একটি বই বের হলো, দুটি বই বের হলো— এভাবে বেশ কয়েকটি। একসময় কিশোরসমগ্র বেরিয়ে গেল।

তারপর দীর্ঘদিন ছোটদের জন্য আর কিছু লেখা হলো না। এই যে লিখছি না তাদের জন্য, এ-কথা ভাবলে খুব মন খারাপ হয় না। ছোটদের জন্য লেখালিখিতে তো অনেক আনন্দ। সেই আনন্দ পেতে হলে ছোটদের জন্য আবার লেখালিখি শুরু করতে হবে। তবে সেই শুরুর আগে, এই যে ‘শ্রেষ্ঠ কিশোরগল্প’ বের হচ্ছে, তা-ও আমাকে অনেক আনন্দ দিচ্ছে বইকি। আর, যাদের জন্য লেখা, তারা এই গল্পগুলো পড়ে আনন্দ পেলো, আমার আনন্দ দ্বিগুণ হবে।

সবার জন্য ভালোবাসা।

মঈনুল আহসান সাবের

সূচিপত্র

বিশ্বায়	১১
থাকা ও না থাকা	১৮
সবচেয়ে সুন্দর	২৬
রাজু তুমি কী চাও	৩২
ছোটমামা, ক্যাস্টর অয়েল ও রোবট	৩৯
একদিন এক রোবট কারখানায়	৪৬
হিমাংকু ও মুল্লার গল্প	৫৪
চিকন আলী রাজাকার	৭৪

বিশ্ময়

ঢাকা শহরে ছ'মাস চাকরি করার পর মুক্তা এক সপ্তাহর ছুটি পেয়েছে। নার্গিস খালাও সে-সময় গ্রামে ফিরবে। মুক্তা নার্গিস খালার সঙ্গেই ফিরেছে। তাকে দেখে তার বাবা-মা খুব খুশি। ছ'মাস হলো তারা তাদের মেয়েকে দেখে না। তাই মুক্তাকে তারা একদম জড়িয়ে ধরল। মুক্তাও খুব খুশি। এত খুশি যে সে-ও বাবা-মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে আরম্ভ করে দিলো। ওর কান্না দেখে ওর বাবা-মা একটু চমকেই গেল। এটা যে খুশির কান্না সেটা তারা বুঝতে পারল না। তারা ভাবল শহরের চাকরিতে মুক্তার বোধহয় খুবই কষ্ট, তাই সে কাঁদছে। তারা অবশ্য তখনই তাকে কিছু জিজ্ঞেস করল না। ভাবল, মেয়ে মাত্র ফিরেছে, পরে জিজ্ঞেস করবে।

মুক্তাকে অত দূরের ঢাকা শহরে চাকরিতে পাঠানোর কোনো ইচ্ছা ওর বাবা-মার ছিল না। ওর বাবা গঞ্জে একটা মিলে কাজ করত। কিন্তু হঠাৎই একদিন, মিলে এক মেশিনের সঙ্গে জড়িয়ে গেল ওর বাবার শরীর। কোনোমতে বাঁচল বটে, কিন্তু কাজ করার ক্ষমতা আর থাকল না। কাজ না করতে পারলে সংসার চলবে কী করে? মুক্তা একটা স্কুলে পড়ত। স্কুলের মাস্টাররাও বলত মুক্তা পড়াশোনায় খুব ভালো। তাই শুনে অনেক কষ্ট করেও ওর বাবা ওকে পড়াচ্ছিল। কিন্তু মেশিনে শরীর জড়িয়ে মুক্তার বাবা পঙ্গু হয়ে গেলে ওর পড়াশোনার উপায় আর থাকল না। ওদের অবস্থা একটু-একটু করে এত খারাপ হয়ে গেল! এ-সময় খুব জ্বর হলো ওর ছোট ভাইয়ের। আর সেই জ্বরে ভুগে-ভুগে আর না-খেয়ে না-খেয়ে ওর ছোট ভাইটা মারা গেল। খুব কাঁদল ওর বাবা-মা, মুক্তাও খুব কাঁদল। এখনও ছোট ভাইয়ের কথা মুক্তার খুব মনে হয়। ওর ছোট ভাইয়ের নাম ছিল মানিক। মানিকের কথা মনে হলে ওর এখনও কান্না পায়। খুব দুঃস্থ ছিল মানিক। মুক্তার চুল ধরে খুব টানত, খামচিও দিত। মাঝে-মাঝে সেজন্য মুক্তার খুব রাগ হতো, তবে ভালোবাসাটাই ছিল বেশি। জ্বরের সময় মানিক কত কী

খেতে চাচ্ছিল, ও খেতে খুব ভালোবাসত, কিন্তু তখন তো ওদের না-খেয়ে থাকার অবস্থা। তারপর, তারপর তো মানিক না-খেয়ে মরেই গেল।

নার্গিস খালা সে-সময় মুক্তাকে অনেকটা জোর করেই ঢাকায় নিয়ে এল। ওর বাবা-মা চাচ্ছিল না, মুক্তারও তেমন একটা ইচ্ছা ছিল না। কে জানে বাবা ঢাকা শহর কেমন-না-কেমন জায়গা। কিন্তু নার্গিস খালা এমন করে ধরল। আর মুক্তার বাবা-মাও দেখল— আসলেই তো। মুক্তা যদি এখানেই থাকে মুক্তাকেও তবে না-খেয়ে থাকতে হবে। বরং মুক্তা যদি শহরে গিয়ে সত্যিই কোনো বাসায় কাজ পায়, তা হলে ওর খাওয়া-পরার চিন্তা থাকবে না। আবার মাস পহেলা কিছু-কিছু টাকাও নাকি পাঠাতে পারবে। এসব ভেবে মুক্তার বাবা-মা রাজি হয়ে গেল। নার্গিস ওদের কয়েক বাসা পরেই থাকে। অনেকদিন হলো ঢাকা শহরের এক বাসায় চাকরি করে। ও কি আর মিথ্যা কথা বলবে।

নার্গিস যে সত্যিই মিথ্যা কথা বলেনি, সেটা বোঝা গেল বিকালে। মুক্তার গ্রামে পৌঁছেছে সকালে। মুক্তাকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে নার্গিস চলে গিয়েছিল নিজের বাড়িতে। দুপুরের পরপর ও এল খবর নিতে। মুক্তা তখন ঘুমাচ্ছে। বাড়ি ফিরে বাবা-মাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছে সে। তারপর খেয়ে নিয়ে সেই যে ঘুমিয়েছে আর ওঠেনি। সারারাত তারা ট্রেনে ছিল। একটুও ঘুম হয়নি। এখন তাই বেশি-বেশি ঘুম হতেই পারে।

মুক্তার বাবা-মা নার্গিসের কাছে জানতে চাইল, শহরের চাকরিতে মুক্তার কি খুবই কষ্ট? কষ্ট না-হলে ও অমন হাউমাউ করে কাঁদল কেন! শুনে নার্গিস বেশ অবাকই হয়ে গেল। যে-বাসায় মুক্তা চাকরি করে সে-বাসায় ওর কোনো কষ্ট হওয়ার কথা না। ঢাকা শহরে খারাপ লোক কম না। বাসার কাজের লোককে তারা খুব মারধরও করে, বেতন দিতে চায় না। কিন্তু মুক্তা যে-বাসায় কাজ করে সে-বাসার লোকজন একদম অন্যরকম। খুব ভালো তারা। নার্গিস জেনেগুনেই মুক্তাকে ও-বাসায় কাজে দিয়েছে। আর, ও-বাসায় কাজের চাপ একদম নেই। একটু পরই মুক্তা ঘুম থেকে উঠে গেল। ওকে জিজ্ঞেস করল নার্গিস। মুক্তা শুনে অবাক গলায় বলল— কী কও, তোমারে না টেরেনে আসতে-আসতে বললাম আমার চাকরি খুব আরামের?

শুনে নার্গিস হাসল— আমিও তো তা-ই কই। কিন্তু তাইলে তুই বাড়ি ফিইরা অত কানলি ক্যান?

মুক্তাও হেসে ফেলল— কী যে তুমি কও-না খালা! বাবা-মারে কতদিন পর দেখলাম। কানমু না?

এবার মুক্তার বাবা-মাও হেসে ফেলল। নার্গিস একটুক্ষণ গল্প করে চলে গেল। তারপর মুক্তার মুখ থেকে শহরের গল্প শুনতে চাইল ওর বাবা-মা।

শহরের গল্পের কি শেষ আছে! একটা গল্প শেষ হয় তো আরেকটা আরম্ভ হয়। যে-বাসায় মুক্তা কাজ করে সে-বাসায় মাত্র তিনজন মানুষ। বাবা-মা আর ৬/৭ বছরের একটা বাচ্চা। মুক্তা বলল, ওই বাচ্চাটা নাকি একদম মানিকের মতো। মুক্তা নাকি মাঝে-মাঝে ওকে ভুল করে মানিকই ডেকে ফেলে। এসব কথা মুক্তা যখন বলল, ওর বাবা-মার মন খারাপ হয়ে গেল। মুক্তারও একটু-একটু চোখ ছলছল করে উঠল। আবার একটু পরই সবার মন ভালো হয়ে গেল। কারণ মুক্তা তখন অন্য কথা বলতে আরম্ভ করল। ও-বাড়ির লোকজন সত্যিই খুব ভালো। মুক্তার কাজ হচ্ছে লাভিব নামের ওই বাচ্চাটার দেখাশোনা করা। মাঝে-মাঝে অবশ্য তাকে ছোটখাটো অন্য কাজও করতে হয়, তবে সে তেমন কিছু না। লাভিবের বাবা-মা তাকে খুব আদর করে। ওরা যা খায়, ঠিক তা-ই মুক্তাকে খেতে দেয়। ওর থাকার জন্য ছোট একটা ঘরও আছে। আবার সেই ঘরের সঙ্গে আছে একটা গোসলখানা। মুক্তা অবশ্য বলল বাথরুম।

এসব শুনতে-শুনতে মুক্তার বাবা-মা খুব অবাক হয়ে গেল। তারপর মুক্তা যখন ওর ছোট ব্যাগ খুলে ওর মধ্যে থেকে দুহাজার টাকা বের করল, ওর বাবা-মা কী বলবে বুঝতে পারল না। প্রথম তিন মাস তিনশো টাকা করে বেতন পেয়েছে মুক্তা, তার পরের তিন মাস পেয়েছে চারশো টাকা করে। বেতনের টাকা থেকে কিছু-কিছু টাকা মুক্তা আগে বাবা-মার কাছে পাঠিয়েছে। নার্গিস খালাকে দিলেই পাঠিয়ে দিত। বেতনের বাকি টাকা আর বকশিশের টাকা মুক্তা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। ওর বাবা-মা কখনও দুহাজার টাকা একসঙ্গে দেখেনি। আবার ওই টাকা যখন মুক্তা ওর মা-র হাতে দিয়ে দিলো, তখন ওর বাবা-মা কী করবে বুঝতে পারল না। এবার ওর বাবা-মাই ওকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে আরম্ভ করল।

মুক্তার ছুটি মাত্র এক সপ্তাহের। ওর বাবা-মার ইচ্ছা ও আরও কিছুদিন থেকে যাক। কিন্তু সেটা সম্ভব না। লাভিবের বাবা-মা ওকে এক সপ্তাহের ছুটিই দিতে চাচ্ছিল না। সুতরাং ঠিক ছ'দিন পরই তাকে রওনা দিতে হবে। তখন ওর বাবা-মা বলল, এই ছ'টা দিন মুক্তাকে তা হলে বাসায়ই থাকতে হবে। কিন্তু মুক্তা তাতেও রাজি না। এটা একটা কথা হলো! এতদিন পর সে এসেছে, বান্ধবীদের সঙ্গে সে দেখা করবে না! তবে বাবা-মাকে সে বলল,

বেশির ভাগ সময় সে বাসায়ই থাকবে এবং তা-ই সে করল। মাঝে-মাঝে সে বাইরে গেল। বাকি সময় বাসায় থাকল।

অনেক বন্ধুর সঙ্গে তার দেখা হলো। বন্ধুরা তো মুক্তাকে দেখে অবাক। তারা বলল মুক্তা নাকি অনেক বদলে গেছে। এত বদলে গেছে যে তাকে নাকি চেনাই যাচ্ছে না। তার স্বাস্থ্য অনেক ভালো হয়েছে, রঙ ফরসা হয়েছে, তার পরনের জামাকাপড়ও কত সুন্দর। বন্ধুরা সবাই তার কাছে ঢাকা শহরের গল্প শুনতে চাইল। একদিন মুক্তা ওর স্কুলেও গেল। স্যারদের পা ছুঁয়ে সালাম করল। স্যাররাও তাকে দেখে যেমন অবাক তেমন খুশি। করিম স্যার মুক্তাকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি বললেন, মুক্তা, তুমি ভালো আছ, এটা দেখে আমার খুব ভালো লাগছে। তবে তুমি যদি লেখাপড়া করতে তা হলে আমি আরও খুশি হতাম। স্যারের এ কথার পিঠে মুক্তা আর কী বলবে! সে চুপ করে থাকল। তখন স্যার বললেন, অবশ্য তোমাকে এই কথা বলার কোনো মানে হয় না। তোমার বাবার যদি ক্ষমতা থাকত, তবে নিশ্চয় তিনি তোমাকে লেখাপড়াই করাতেন। ১২/১৩ বছর বয়সে তোমাকে অন্যের বাসায় কাজ করতে পাঠাতেন না।

এসব কথা এখন মুক্তা বোঝে। সত্যিই তো, তার বাবা যদি এখন সুস্থ থাকত, তা হলে কি তাকে অতদূরে অন্যের বাসায় কাজ করতে যেতে হতো। কিংবা তাদের যদি কোনো অভাব না-থাকত, বাসায় সবসময় অনেক-অনেক খাবার থাকত, তা হলেও তাকে কাজ করতে যেতে হতো না। কিন্তু তাদের বাসায় তো দিনের-পর-দিন কোনো খাবারই ছিল না। তবু তার বাবা-মা চাচ্ছিল না সে কাজে যাক। কিন্তু নার্গিস খালা অমন করে ধরল আর সে-ও ভেবে দেখল— সত্যিই তো, আর কী উপায়!

মুক্তা বন্ধুদের সঙ্গে কিছু-কিছু সময় কাটাল। আর বেশি-বেশি সময় কাটাল বাসায়, বাবা-মার সঙ্গে। ওর মা এখন গ্রামেই এক বড়লোকের বাসায় টুকটাক কাজ করে। মা তাই সবসময় বাসায় থাকে না। বাবা বেশি নড়াচড়া করতে পারে না। বাবা থাকে বাসায়। বাবার সঙ্গেই মুক্তার কত যে গল্প! বাবা তার কাছ থেকে সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চায়। আর যা-শোনে তাতেই অবাক হয়ে যায়। মুক্তা একা-একা টেলিভিশন চালাতে পারে শুনে বাবা কতক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর যখন শোনে মুক্তা যখন-তখন ফ্রিজ খোলে আর ঠান্ডা পানি খায়, তখন আরও অবাক হয়ে যায়। মুক্তা বোঝে বাবা আসলে ওসব গল্পই শুনতে চায়, যেসব গল্প শুনলে সে অবাক হয়ে যাবে।

মুক্তা তাই মনে করে-করে ওসব গল্পই করে। কম্পিউটার নামে একটা যন্ত্র আছে, ওইটার মধ্য দিয়ে নাকি অনেক দূর-দূর থেকে চিঠি আসে। শুনে বাবা অবাক, কী আশ্চর্য কথা, চিঠি তো পোস্ট অফিসের লোকই দিয়ে যায়! মুক্তা বলে, লাবিবের বাবার ছোট একটা যন্ত্র আছে, ওটার নাম নাকি মোবাইল ফোন। ওটা দিয়ে নাকি অনেক দূরের দেশেও কথা বলা যায়। আবার একটা ক্যামেরা আছে। লাবিবের মা ওটা দিয়ে মুক্তার একটা ছবি তুলল। তারপর তখনই ছবিটা ক্যামেরা থেকে বের করে দিলো। ওই ছবিটা আনতে ভুলে গেছে মুক্তা, সামনের বার নিয়ে আসবে। লাবিবের সঙ্গেও তার একটা ছবি আছে, ওটাও সামনের বার নিয়ে আসবে।

এসব গল্প রোজ-রোজ কত আর করা যায়! কিন্তু বাবার শুধু এসব গল্প শোনারই ইচ্ছা। শেষে মুক্তা এই ছ'মাসে যেখানে-যেখানে বেড়াতে গেছে, সেসব জায়গার গল্প করতে আরম্ভ করল। এসব গল্প শুনেও বাবা খুব অবাক হলো। শিশুপার্কের গল্প শুনে একদম হাঁ করে তাকিয়ে থাকল। তারপর জাদুঘরের গল্প শুনল। হাসতে-হাসতে বলল— বুঝছস মা, আমার শরীর যদি সুস্থ থাকত, তাইলে একবার হইলেও ঢাকা শহরে যাইতাম।

মুক্তার মা অবশ্য অত অবাক হয় না। বরং মুক্তার গল্প শুনতে-শুনতে ওর বাবা যখন চোঁচিয়ে-চোঁচিয়ে ওর মাকে ডাকে, ওর মা বলে— তুমি কী বলবা, আমি জানি। ওর মা বলে— এত অবাক হওনের কী হইল! ওইটা হইতেছে ঢাকা শহর। ওইখানে তো এইসব আজব-আজব ব্যাপার থাকবই। মা এ-ধরনের কথা বললে মুক্তা ওর বাবার পক্ষে দাঁড়ায়।

বলে— তবু মা, কী যে সব অবাক-করা ব্যাপার! বুঝছ মা, দেখলে হাঁ হইয়া যাইতে হয়। মা তখন মুচকি মুচকি হাসে। মুক্তা বোঝে, আসলে মা-ও খুব অবাক হয়। শুধু বাবার সঙ্গে দুষ্টুমি করে ওরকম কথা বলে।

দেখতে-দেখতে মুক্তার ঢাকা ফেরার সময় হয়ে গেল। ওর বাবা আর মা-র মন-খারাপ তো হবেই। মুক্তারও খুব মন খারাপ। ওর বাবা-মা দুজনই বলল— মারে, তোরে ছাইড়া থাকতে আমগো কী যে মন-খারাপ হয়! ওর বাবা বলল— আমি তোর বাবা। আমারই তো তোর দেখভাল করার কথা। আমি পারি না। উল্টা তুই বাচ্চা মাইয়া হইয়া চাকরি করতেছিস। এসব কথাবার্তায় সবারই মন-খারাপ হয়ে গেল। তবে সেটা বেশিক্ষণ থাকল না। মুক্তার বাবা মুক্তার মন ভালো করার জন্য খুব গল্প জুড়ে দিলো। ওর মা আজকে কাজে যায়নি। মুক্তা চলে যাবে বলে বাসায় আছে। আর একটু ভালো খাবার রান্না করছে।

মুক্তার বাবা বলল— মা, তুই ঢাকা শহরের গল্প বল। তখন মুক্তার মা-ও এসে পাশে বসেছে। মুক্তা বলল— বলো তো মা, ঢাকা শহরের গল্প আর কত বলমু! বাবা হাসল— কী কী দেইখা অবাক হইছস, সেইসব বল। মুক্তাও একটু হাসল— আর কত বলমু! সব তো বইলা ফেলছি। ... লাবিবেরা ঘরে বইসা সিনেমা দেখে, জানো? মুক্তা তার বাবাকে খুশি করার জন্য ভেবে-ভেবে খুঁজে-খুঁজে আরও কিছু ঘটনার কথা বলল। বলল, টেলিভিশনের পর্দায় ১৬ রকম ছবি দেখার কথা, বলল ভিডিও করার কথা, বলল গাড়ির ভেতরটা ঠান্ডা করার যন্ত্রের কথা, এরকম আরও কত কী বলল। ফ্রিজের ভেতর সবসময় কত খাবার থাকে, সে-কথাও সে বলল। বলে একটু লজ্জা পেল।

মুক্তার বাবা বলল— হায়রে মা, তোর কী কপাল! তুই কত কী দেখতাহোস। মুক্তার মা মুচকি হেসে বলল— এত অবাক হওনের কী আছে! ঢাকা শহরে এইসব তো হইবই। মুক্তার বাবা এবার একটু রেগেই গেল— বারবার তুমি এই এক কথা বলবা না। এইসব কি আমরা দেখছি? মুক্তার বাবার রাগ দেখে ওর মা হাসি লুকাল, বলল— ঠিক আছে মুক্তা, তুই বল-আমরা আর কী কী দেখি নাই। মুক্তাও এবার হেসে ফেলল— আর তো কিছু নাই। সব তো বইলা ফেলছি। মুক্তা তবু ভাবল একটুক্ষণ। কিন্তু তার আরকিছু মনে পড়ল না। তখন ওর বাবা বলল— তাইলে তুই এক কাজ কর। তুই কোনটা দেইখা সবচেয়ে বেশি অবাক হইছস, সেইটা বল। মুক্তার মা বলল— হ মা, সেইটাই তুই বল। আমি শুইন্যা রান্না দেখতে যাই।

মুক্তা পড়ে গেল বিপদে। এখন কী বলবে সে! শহরে গিয়ে কত কী দেখেছে সে আর কত অবাক হয়েছে। তবে এখন আর সে অবাক হয় না। এখন তার মনে হয় ওরকম হতেই পারে। কিন্তু বাবা-মাকে এখন সে ওর মধ্যে থেকে কোনটার কথা বলবে? একটু ভাবল সে, তারপর আরও একটু ভাবল। হঠাৎ করে একটা কথা মনে হলো তার। সে ভাবল, এটা বলা যায়। কারণ, আর সবকিছু তার কাছে স্বাভাবিক হয়ে এসেছে, ওসব দেখে সে আর অবাক হয় না। কিন্তু এই একটা ব্যাপার সে রোজ-রোজ যত দেখে, ততই অবাক হয়।

একটু হাসল সে। বাবা-মার দিকে তাকাল। বলল— লাবিবের কথা শুনবা? লাবিবের একটা ব্যাপার দেইখা আমি এখনও অবাক হইয়া যাই।

মুক্তার বাবা-মা উৎসুক হয়ে তার দিকে তাকাল।